আজ এবং ফিরে দেখা কাল

তোয়াব খান

দেশের সংবাদপত্র জগতে মওসুমী বায়ুটা হঠাৎ কিছু গতি পেয়ে গেছে। পুঁজিঘন সংবাদপত্র শিল্পে বিত্তবৈভবের সাদাকালো রাঘববোয়ালরা নেমে পড়েছেন। এমন একটা ধারণা জন্ম নিয়েছে, রাজশক্তির আনুকূল্যে সাফল্যের জাদুদণ্ডটি স্পর্শ করা অনায়াসসাধ্য। বহুদিনের চর্চিত পৃষ্ঠপোষকতা এ ধরনের আজ্ঞাবহ চিন্তাস্রোত সৃষ্টিকে সহজতর করে তুলেছে। সুস্থ প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরির পরিবর্তে পৃষ্ঠদেশের পোষকতা প্রায় মজ্জাগত। বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৯৫৪ সাল থেকে ২০০৪) কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আলোচ্য ধারাটি প্রায় ছেদহীন।

পঞ্চাশ বছরের প্রেক্ষাপটটি জাতীয় প্রেস ক্লাবের জন্যে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে সংবাদপত্র শিল্পের গতিপথও একইভাবে নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রবাহিত। একদা পঞ্চাশের দশকে আদর্শবাদের মোড়কে অগ্রসরমান সংবাদপত্রের পথচলা অনিবার্যভাবেই ছিল সমস্যাসঙ্কুল। তবুও সুস্থ নৈতিকতার একটা বাতাবরণ সাংবাদিকতার জগতকে ঘিরে রেখেছিল। ভাষার জন্যে, দেশের জন্যে, গণতন্ত্রের জন্যে সাংবাদিকরা জেল খেটেছেন। রাজরোষে নিগৃহীত হয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সামরিক শাসকের জংলী আইনকানুন সবার আগে কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে সংবাদপত্রের। গায়ের জোরে 'অবাধ পুঁজির' স্তাবকরা দখল করে নিয়েছে বেসরকারী মালিকানার সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে। জেল-জুলুম তো নিত্যসঙ্গী। এমনকি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে জেলে পুরে দেয়া হয় একঝাঁক সাংবাদিককে। কাউকে বা নিজ এলাকা ছেড়ে সুদূর কোনও নগরে গিয়ে পেশাদারি করতে হয়েছে।

মাথা তবুও নত হয়নি। পুরো ষাটের দশক তার বড় প্রমাণ। শিক্ষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগেই থেকেছেন সাংবাদিক সমাজ। সংবাদপত্র শিল্পের জন্যে নিকৃষ্টতম কালো আইন হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তানী শাসকদের 'সংবাদপত্র প্রকাশনা অধ্যাদেশ' বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক অশীতিপর মওলানা আকরম খাঁও সে সময়ে ছিলেন মিছিলের নেতৃত্বে। 'দস্তুরে জবাবন্দী নাহি চলে গা' এ আওয়াজ রমনার রাজপথ থেকে প্রতিধ্বনি তুলেছিল রাওয়ালপিণ্ডির নানা প্রকোষ্ঠে। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'– সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় দেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) সব ক'টি প্রধান ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে একযোগে একই

স্থানে একই ব্যানার হেডলাইনে একই আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পিণ্ডির বশংবদ' সাংবাদিকদের লোক সমাজে মুখ দেখানোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এসবই সাংবাদিকদের তথা সংবাদপত্রের অক্ষয় অমর গৌরবগাথা। কিন্তু 'পুঁজিঘন' সংবাদপত্র শিল্পের চাকা রাজনীতির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল না। ষাটের দশকে রাজনীতিতে নতুন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সংবাদপত্র জগতে তখন বেজে উঠেছে আরেক সুর। সুপরিকল্পিত বঞ্চনার শিকার এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশের গতি ছিল পশ্চাৎমুখী। শিল্প স্থাপন তথা অগ্রগতি ছিল শ্লথ। ঢাকার চার প্রধান সংবাদপত্র ছিল সরকারের কালো তালিকাভুক্ত। দেশের জনগণের ট্যাক্সের টাকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোনও অর্থই তাদের জুটত না। কারণ সরকারী বিজ্ঞাপন ছিল বন্ধ। অবস্থাটা আজকের দিনেও একেবারে অচেনা মনে নাও হতে পারে। আজও আমরা বলতে গেলে আইয়ুবী কালিতেই দাগ কেটে চলেছি। তবে আজকের কালিটা সম্ভবত অমোচনীয়।

এ কথাগুলো বলার একটিই কারণ। আমাদের সাংবাদিকতায় এবং সংবাদপত্র জগতে সব ধরনের আদর্শিকতা ও সুস্থ নৈতিকতার অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপট একটু খতিয়ে দেখা।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে অর্থনীতির চালিকাশক্তিগুলো সংবাদপত্রের জগতকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলতে শুরু করে। বৃহৎ পুঁজি উদ্যত হয় ছোট পুঁজিকে গ্রাস করতে। এমনকি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় খবরদারিতে শীর্ষ আমলাদের নেতৃত্বে ট্রাস্ট গঠন করে নেমে পড়ে সংবাদপত্র শিল্পে একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠায়। পাকিস্তানে বৃহৎ পুঁজির সংগঠন ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ঢাকা থেকে নতুন একটি পত্রিকা বের করে 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে এবং নবাব পরিবারের মালিকানাধীন মর্নিং নিউজ পত্রিকাটি তারা কিনে নেয়। স্বভাবতই মার খায় এতদঞ্চলের ছোট ছোট সংবাদপত্র, যারা এতদিন গণতন্ত্র ও দেশ হিতৈষণার আওয়াজ তুলে নিজেদের অস্তিত্ব কোনওমতে রক্ষা করে চলেছিল।

সংবাদপত্র এমন একটি শিল্প, যেখানে মধ্যবর্তী স্তরের কোনও সুযোগ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সর্বশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিকাশ লাভ অবধারিত ভবিতব্য। নচেৎ অনুগমন, পশ্চাদানুসরণ এবং পরিণামে একদিন পদস্খলন। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা প্রথম রোটারি মেশিনে ছাপা উপলক্ষে সগর্বে একটি ঘোষণা প্রকাশ করেছিল। 'এখন থেকে অবজারভার ইংল্যাণ্ড থেকে আনা রোটারি মেশিনে রাশিয়ান নিউজ প্রিন্টে ভারত থেকে আনা কালিতে ছাপা হয়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছবে।' পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় আগে এ ধরনের একটি ঘোষণায় চমক লাগানোর মতো উপাদান যথেষ্ট আছে বৈকি! কি পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়েছিল বা কিভাবে কোন কোন দেশের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়েছিল, আজকের দিনে ভাবতে গেলেও বিস্ময়কর মনে হতে পারে। তবে আরও চমকপ্রদ ঘটনা হলো– পাকিস্তান অবজারভারের পথ ধরে পাকিস্তানের আদি ও অকৃত্রিম দৈনিক আজাদও রোটারি মেশিন এনে ফেলল। শোনা যায়, সেকালের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ইস্পাহানীদের সহযোগিতায়। বসে থাকেনি আরেক পাকিস্তানী বশংবদ ঢাকার নবাব পরিবারের পত্রিকা মর্নিং নিউজও। এর পর সংবাদপত্র জগতে যাঁরা

নতুন এসেছেন, তাঁদের শুরু করতে হয়েছে প্রযুক্তির বেঁধে দেয়া এই সোপান থেকেই। অর্থাৎ রোটারি মেশিনকেই মুদ্রণ যন্ত্র হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে।

একইভাবে ষাটের দশকের মধ্যভাগে সংবাদপত্র জগতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাকিস্তান অবজারভার একটি ছোটখাটো বিপ্লব ঘটিয়ে বসে ছাপার জগতে, 'ওয়েব অফসেট' মেশিন চালু করে। ওয়েব অফসেট মেশিন মুদ্রণ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দরোজা খুলে দেয়। প্রতিযোগিতার মুখে দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাকসহ আরও কিছু পত্রিকাকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হয়। নতুন প্রযুক্তি সচিত্র সংবাদ প্রকাশে কী ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল '৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের সচিত্র কভারেজ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে এসেছে ফটোসেটার ও কম্পিউটার কম্পোজ পদ্ধতি। গুটেনবার্গের মহাআবিষ্কার 'কাঠের টাইপ' আজ জাদুঘরের বিষয়। আজকের বাংলাদেশে প্রত্যন্ত শহরগুলোতেও চলছে কম্পিউটার প্রযুক্তির দাপট। কথায় কথায় প্রিন্ট আউট বের করে পাঠানো হচ্ছে যত্রতত্র। প্রযুক্তির সর্বশেষ অবদান বা চ্যালেঞ্জ থেকে পিছিয়ে পড়ার কোনও উপায় নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নইলে মৃত্যু।

দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র তথা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের (Electronic Media) বেলায় মধ্যবর্তী স্তরের প্রযুক্তির (Intermediate Technology) স্থান খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। জাতিসংঘ এক সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মধ্যবর্তী প্রযুক্তি গেলানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিণাম তো সবার কাছে পরিষ্কার। আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের যখন রঙিন রূপান্তর ঘটে, অনেকেই এটাকে অনাহারক্লিষ্ট মহিলার রুজ লিপস্টিক লাগানোর কথা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কার মতো দেশ রঙিন টিভিতে যাচ্ছে না। আর এক শ' ডলারের কম মাথাপিছু আয়ের দেশ বাংলাদেশের জন্যে এটা তো বিলাসিতা! কিন্তু গণমাধ্যমে প্রযুক্তির রথ বা ট্রেন মিস করার উপায় নেই। এক বছরের মধ্যেই শ্রীলঙ্কা টিভিকে বহুবর্ণের রঙিন পথেই হাঁটতে হয়েছে।

ওয়েব অফসেট, কম্পিউটার কম্পোজ, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট ইত্যাদি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি এসে যায় দক্ষ জনশক্তি বা লোকবলের কথা। ষাটের দশকের মধ্যভাগেই দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বাড়তে থাকে। সাংবাদিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল প্রথম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ দুর্বল পুঁজির সংবাদপত্রে রীতিমতো ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়ে যায়। যদিও তারা কোনও সময়েই এই রোয়েদাদ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি। একদিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অমোঘ বিধান, দক্ষ ও পেশাদারি জনবলের চাহিদা এবং সাংবাদিক সমাজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সংগ্রাম, অন্যদিকে পুঁজির তীব্র প্রতিযোগিতা সংবাদপত্র জগতে সৃষ্টি করে এক নতুন মেরুকরণ। ফলত আদর্শিক নৈতিকতার শধু অবক্ষয়ই নয়, সৃষ্টি হয় নতুন প্রেক্ষিত। বনেদী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে উঠতি পুঁজির সংঘাতে নতুন নতুন সমীকরণ ঘটতে থাকে। সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে সংবাদপত্র জগতে দেখা দেয় বিস্ময়কর সব ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল তো অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সচেতন সাংবাদিক মাত্রেই নিজের অবস্থানকে দেশমাতৃকার

পক্ষেই সুসংহত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে কয়েক বছরের জন্যে সংবাদপত্রের ঐতিহ্যবাহী ধ্যান-ধারণা প্রায় বিপর্যস্ত তথা ছত্রখান হয়ে পড়ে। ট্রাস্ট বাতিলের ফলে এবং মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে চারটি বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিকানা কার্যত সরকারের হাতে গিয়ে পৌঁছে।

সদ্য স্বাধীন, মুক্ত এবং বিধ্বস্ত দেশে সমস্যা অন্তহীন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আশ্বাস পুনঃ পুনঃ দেয়া হলেও স্বাধীন গণমাধ্যমের মুক্ত বিকাশের উপাদানগুলো সত্যিকার অর্থে অনুপস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, শিল্পকারখানা অধিকাংশ বন্ধ। অন্যদিকে সম্পাদকীয় লেখার জন্যে সম্পাদক অপসারিত; কিছু কিছু সংবাদপত্রে চলছে ভিত্তিহীন রটনা– সব মিলিয়ে সুস্থ পরিবেশের অনুপস্থিতি বড় প্রকট। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কয়েকটি বছর সংবাদপত্রের জন্যে মনে হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকাল। সরকার সংবাদপত্রের মালিকানা দাবি করেছে, কিন্তু আর্থিক সংস্থানের কোনও দায়িত্ব নেয়নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জোর গলায় দাবি করেছে। কিন্তু স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা (টেলিগ্রাম) বের করতে গিয়ে অপসারিত হয়েছেন দুই সম্পাদক। এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি ভয়াবহ পরিণতিতে দাঁড়ায় ১৯৭৫ সালের জুন মাসে, চারটি বাদে সকল পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশন বাতিলের মাধ্যমে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের বিকাশে পুঁজির প্রতিযোগিতা কোনও ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ, সরকারী মালিকানার আগ্রাসী পদক্ষেপ এবং প্রতিযোগী পুঁজির অনুপস্থিতি। বেসরকারী মালিকানার সংবাদপত্রসমূহ সানন্দে সরকারের সহযোগী ভূমিকা পালন করে। সরকারদলীয় কতিপয় রাজনৈতিক নেতা পরিত্যক্ত ছাপাখানা দখল করে রাতারাতি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিক বনে যান। কেউ কেউ 'পরিত্যক্ত' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকরূপে আবির্ভূত হন। এ অবস্থায় সংবাদপত্র জগতে প্রায় সবার অলক্ষ্যেই একটি সমূহ সর্বনাশ ঘটতে থাকে– সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান (Editorial Institution) যা সম্পাদকের মাধ্যমেই প্রতিভাত, তার পতন। একে একে ঘটে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসসাধন। সরকারী এবং বেসরকারী দু'তরফেই এই অধঃপতনটি পরিলক্ষিত হয়।

শুরুতেই কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়ায়নি। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে প্রেস ট্রাস্টের দু'টি পত্রিকায় এবং হামিদুল হক চৌধুরীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অবজারভারে প্রশাসক ও সম্পাদক পদে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ অবস্থায় সম্পাদকের পক্ষে নিজস্ব সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা অনেক সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু একে একে সম্পাদকরা প্রশাসকও (Administrator) বনে গেলেন। তাই সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব উঠল চুলোয়। দৈনন্দিন জমা খরচের হিসেব মেলাতেই তাঁর প্রাণান্ত।

তথাকথিত সরকারী সংবাদপত্রের এই অবস্থা খুব স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারী মালিকদেরও উৎসাহিত করল। এক সম্পাদককে কলামিস্ট বানিয়ে মালিক হয়ে গেলেন সম্পাদক। মালিকপুত্র রাতারাতি সম্পাদক হয়ে যান। রাজনৈতিক নেতা ছাপাখানা দখল করে দৈনিক

সংবাদপত্র বের করলেন। এবং যথারীতি হলেন প্রবল পরাক্রমশালী সম্পাদক। পরবর্তীকালে সংবাদপত্র বেতন বোর্ড রোয়েদাদে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহীর পদ এক করে সজ্ঞানে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যুতে ঘৃতাহুতি দেয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। অন্যদিকে প্রধান নির্বাহী ও সম্পাদকের পদ একীভূত হওয়াতে বেসরকারী খাতের নতুন নতুন পত্রিকার মালিকরাও রাতারাতি সম্পাদক বনে যান। তবে ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই থাকে, এখানেও আছে।

বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ নতুন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকের সংগ্রামী বলিষ্ঠতা আর ফিরে পায়নি। সংবাদপত্রবহির্ভূত একাধিক উপাদান, অদূরদর্শী স্বল্পমেয়াদী কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা নতুন চিন্তা-চেতনার জন্ম দিতে থাকে। স্বাধীন দেশের অবারিত সম্ভাবনা-সম্ভারও হাতছানি দেয়। হয়তো এভাবেই পুরনো প্রেক্ষিতটা বদলে যায়। পেশাগত সমস্যার আলোচনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও জট খোলার মতো সংগ্রামী চেতনা চোখে পড়ে না। সংবাদপত্রের প্রকাশনা বাতিলের মতো ভয়ঙ্কর পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সংগ্রামী চেতনার বহির্প্রকাশ দেখা যায়নি। অন্যদিকে পঁচাত্তরের সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী দেশবিরোধী পটপরিবর্তনের পর কণ্ঠরোধী নীরবতা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সর্বত্র। এক কালে যাঁদের কণ্ঠে গণতন্ত্রের জন্যে মর্সিয়া ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী, বাকস্বাধীনতার সর্বগ্রাসী বিলোপেও নীরবতা পালন তাঁরা শ্রেয় মনে করতে থাকেন। একদলীয় শাসন বিলোপ করতে গিয়ে ঘটে যায় রাজনীতির শিরশ্ছেদ। সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসন, তথাকথিত বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা। রাতের অন্ধকারে অপহরণের মাধ্যমে খুন। চোখের সামনে এসব ঘটে গেলেও সাংবাদিক সমাজের নীরব দর্শকের ভূমিকা ছিল নিতান্তই দৃষ্টিকটু। সেনা শাসনের হরেকরকম বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত্ করতেও দেখা গেছে অনেককে।

ব্যতিক্রমী কার্যক্রম চোখে পড়তে শুরু করে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। সামরিক শাসকের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংবাদপত্র বন্ধ রাখা, পেশার সংগ্রামে সংবাদপত্রের প্রকাশনা স্থগিত করে দেয়া–দীর্ঘদিন পর আবার নব উত্থানের ইঙ্গিতবাহী। এটারই পরিণতি নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

দীর্ঘ সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর্যালোচনা একটি নিয়ামক হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। '... 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;/যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,/যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।' শাসন আর শোষণের গর্জন যত প্রবলই হোক, নিরস্ত্র সত্যের বর্ম দধীচির অস্থির চেয়েও মজবুত। সত্যের কাছে অন্যায় আর মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অর্জিত গণতন্ত্রের যুগেও দেখা গেছে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেউ হাতে তুলে দিয়ে যায় না। সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একালে ফতোয়া, ইসলামী অনুশাসনের নামে মোল্লাদের বাড়াবাড়ি, মৌলবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও মহাগর্হিত বলে প্রচার করা হতো। মৌলবাদীদের নানা কুকর্মের দেয়ালটা ভাঙার জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন ছিল। জনকণ্ঠের তিন সম্পাদকের কারাবাসের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী আতঙ্কের দেয়ালটা চুরমার হয়ে গেছে। তবে

গণতান্ত্রিক পরিবেশে আইন-আদালতের পথটা সবার জন্যেই উন্মুক্ত। তাই স্বাধীন সংবাদপত্রকে আদালতের কাঠগড়ায় ওঠার জন্যে প্রস্তুত থাকাই উত্তম।

আজকের বাংলাদেশে সংবাদপত্রে পুঁজির ঘনীভবন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং দক্ষ পেশাদার লোকবলের অন্বেষণ প্রায় সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত হয়ে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট। তাই কেউ নিজ দেশে সবার কথা বলতে উদ্‌গ্রীব, কেউ বা নবদিগন্ত কতদূর বিস্তৃত করবেন সে চিন্তায় ব্যস্ত। কোন কালে সমকালের গুরুত্ব পাবে সেটা কারও কারও মাথা ব্যথার কারণ। রাজধানী ঢাকাতেই তথাকথিত 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' পত্রিকাসহ নাকি শ' দেড়েক দৈনিক সংবাদপত্র বের হয়! কে বা তাদের সম্পাদক, কোথায় এদের সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব বা ইনস্টিটিউশন, কে-ই যোগায় তাদের পুঁজি– এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার মতো কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে বলে মনে হয় না। তবে আজকের দিনে একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে গেলে যে কোটি কোটি টাকা প্রয়োজন, এটা বাচ্চারাও জানে। পুঁজিঘন এ শিল্পে টাকা তো ঢালতে হবেই, এমনকি পত্রিকা বের হওয়ার আগেই তো মাসের পর মাস বিপুলসংখ্যক কর্মীকে পরিপোষণ করতে হয়। তাই সাদা হোক আর কালো হোক, পুঁজি চাই। শিল্পপতিরা একযোগে একটি সংস্থা গঠন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। কোনও ট্রাস্টের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে টাকা ঢালতে পারেন। আবার কেউ বা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে টাকা-পয়সা নিয়ে এসে বিনিয়োগ করতে পারেন। সবই পারেন আইনকানুন ও বিধিবিধানের গণ্ডির মধ্যে। তবে হ্যাঁ, আগেই বলেছি যদি পৃষ্ঠপোষকতা থাকে, নো চিন্তা! আপনি একটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মালিক হয়ে যান, সংবাদপত্র বের করুন। আধুনিক কোনও ক্লাবে পুঁজি বিনিয়োগ করুন। সব হবে। আবার পিঠে যদি গোলমাল হয়, তবে পেটে খেলেও পিঠে সইবে না।

কেন এ ধরনের অবস্থার উদ্ভব? আদর্শ চিন্তা-চেতনা, সুস্থ নৈতিকতা তথা সাংবাদিকতার সাধারণ নীতিমালা বিসর্জনের প্রবল মানসিকতা কেন? এমন একটি অবস্থার উদ্ভব যে রাতারাতি ঘটেছে, তাও নয়। বাজার অর্থনীতির যুগে নিজের হাতে গড়া সুন্দর প্রতিষ্ঠান, চমৎকার সংগঠন বা বলিষ্ঠ খবরের কাগজকে নিজের হাতে রাখা যায় না। পুঁজির বাজার তাকে খুঁজে বের করে নিজের কাছে নিয়ে যায়। এককালের আদর্শবাদী সাংবাদিকরা বাজার ঘুরতে গিয়ে বাজারী হয়ে যান। ব্যবসা আর সাংবাদিকতার সীমারেখা ঘুচে একাকার হয়ে যায়। গালভরা সুবচন নিয়ে 'পাইকারি বাজারে' বসার সঙ্কোচটাও ঘুচে যায়।

আমরা এখনও 'ছোট প্রাণ ছোট আশা', তাই ছোটখাটো বিষয় নিয়েই বেশি ব্যস্ত। মাত্র দেড় শ' কোটি টাকার টিভি বিজ্ঞাপন নিয়েই কামড়াকামড়ি তিন টিভি চ্যানেলে, যদিও এর এক শ' কোটি টাকাই চলে যায় বিটিভিতে। একুশে টিভি থাকতে অবশ্য চিত্রটি অন্যরকম ছিল। বিটিভির আয় তখন ৪০ কোটিতে নেমে এসেছিল। আমাদের দেশে পুঁজির এমনই বেহাল দশা। পাশের দেশ ভারতে দশটি বড় গণমাধ্যম (মিডিয়া) কোম্পানি ২০০২-২০০৩ সালে আয় করে ৭ হাজার ৫শ' ৩৩ কোটি রুপী। বিজ্ঞাপনে সামগ্রিক পুঁজির লেনদেন ১৫ থেকে ১৬ হাজার কোটি রুপী।

বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র তথা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম গড়ে তুলতে হলে অবিলম্বে পরিহার করতে হবে আইনকানুন বিসর্জন দেয়া পৃষ্ঠপোষকতার নীতি। দলবাজি তথা অগণতান্ত্রিক নিয়মনীতি বাতিল করে সুস্থ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক